Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শির্ক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুলতানা হাবিবাহ্ আজিজ

রোলঃ 216021566

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শির্ক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুলতানা হাবিবাহ্ আজিজ

রোলঃ 216021566

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "শির্ক" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুলতানা হাবিবাহ্ আজিজ, আইডিঃ 216021566 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ শির্ক ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সুলতানা হাবিবাহ্ আজিজ

(স্বাক্ষর)

সুলতানা হাবিবাহ্ আজিজ

আইডিঃ 216021566

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

শির্কের প্রকারভেদ..7

প্রথম প্রকার : শির্কে আকবার বা বড় শির্ক.................................7

শির্কে আকবারকারীর পরিণতি...8

দ্বিতীয় প্রকার : শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক..............................12

তৃতীয় প্রকার : শির্কে খফী বা গোপন শির্ক.................................16

শির্কের উৎপত্তি 18

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক...19

শিরকী কর্মসমূহের বিবরণ 21

প্রতিপালনের শিরক...21

আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি...22

ইবাদতের শিরক 23

গাইরুল্লাহর সাজদা...24

গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত 25

গাইরুল্লাহর জন্য তাওয়াফ 27

তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শিরক 28

শিরকের সেকাল ও একাল 29

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি...31

ভয়ঙ্করতম পাপ 32

কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না 32
শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে 33
শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ 34
শির্ক প্রতিরোধে কুরআন এবং সুন্নাহ 36
মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা 36
ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা 37
নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা 37
ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা 38
শির্ক গুনাহ আল্লাহ করবেন কিনা 41
ইস্তেগফার: মুমিনের জীবনে মুক্তির রাজপথ 41
উপসংহার 46

ভূমিকা

মুসলিম জীবনে তাওহীদ বা একত্ববাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীতে রয়েছে শীর্ক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে কাউকে শরীক করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাওহীদের বার্তা দিয়ে আল্লাহ যুগে যুগে বহু নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। ইমানের প্রথম মৌখিক স্বীকৃতি হলো "لا إله الاّ الله" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুসলিম মুমীন মাত্রই এক আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। মানব জীবনে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে শির্ক। কুরআনুল কারিমে সূরা লোক্বমানের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন -إنَّ الشّرِكَ لظلم عظيم অর্থাৎ নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ।

শির্কের পরিচয়: শির্ক অর্থ অংশীদার হওয়া, অংশীদার করা বা সহযোগী বানানো। কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে আল্লাহর সমতূল্য, সমকক্ষ বা তুলনীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।”

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।”

আল্লাহর কোনো ক্ষমতায়,

গুণে বা ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করাই শিরক। বিশ্ব সৃষ্টি, পরিচালনা, জীবনদান, মৃত্যুদান, বৃষ্টিদান, অলৌকিক সাহায্য, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদি সকল ক্ষমতা আল্লাহর। অন্য কারো এরূপ কোনো ক্ষমতা বা অধিকার আছে বলে বিশ্বাস

করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহর মহান গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক। অন্য কারো এরূপ গুণ আছে বলে মনে করা শিরক। অনুরূপভাবে সাজদা, দোয়া, মানত, জবাই, তাওয়াক্কুল, ভরসা, নির্ভরতা, অলৌকিক ভয়, আশা ইত্যাদি সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। অন্য কারো জন্য এগুলি করা অর্থ এগুলিতে তাকে আল্লাহর অংশীদার বানানো।

এখানে আমাদের মনে হতে পারে, আমরা তো মুসলিম, আমাদের তো শির্ক এর কোনো ভয় নেই। বেঈমানগণ শিরক বা কুফরীতে লিপ্ত। মুমিন তো শির্ক থেকে মুক্ত। কিন্তু কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ ঈমানদারই শিরক-এর মধ্যে লিপ্ত। আল্লাহ বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং সেই অবস্থায় তারা শির্কে লিপ্ত থাকে।

কুফরীর অন্যতম প্রকাশ শিরক।

সাধারণত যুগে যুগে কাফিরগণ আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপলকত্ব, মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অস্বীকার করে কুফরী করে নি, বরং এগুলিতে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করেই কুফরী করেছে। ইহূদী, খৃস্টান আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য অনেক জাতি নবী, রাসূল ও আসমানী কিতাব পাওয়ার পরেও আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও শিরক করেছে। আমরা দেখেছি যে, মক্কার কাফিররা এবং কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য কাফির জাতি আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শিরকে লিপ্ত হতো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতো। এজন্য শির্ক-এর কারণ এবং প্রকার ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের জন্য অতীব জরুরী, যেন আমরা শিরক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

শির্কের প্রকারভেদ

শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শির্ককারীর পরিণতি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শির্ক মূলত তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : শির্কে আকবার বা বড় শির্ক

শির্কে আকবার এর সংজ্ঞা :

বিশ্বাস জাতীয় বিষয়াদি ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক বা সমান করাই মূলত শির্কে আকবার। কুরআনুল কারীমে উপাসনা কেন্দ্রিক শির্ক সম্পর্কে অধিক আলোচনা হওয়ার কারণে অনেকে শির্কে আকবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটাকে শুধু উপাসনার সাথেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন-

কেউ এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন : ''শির্কে আকবার হচ্ছে : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যেমন- অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট কিছু কামনা করা, অন্যকে ভয় করা, অন্যকে আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসা, অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ বা মানত করা।''

কেউ আরো সংক্ষেপ করে বলেছেন : ''আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে আহ্বান করাই হচ্ছে শির্কে আকবার।''

কেউ বলেন : ''আল্লাহর উপাসনাসমূহের কোনো উপাসনা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।''[1] তবে যেহেতু শির্কে আকবার কেবলমাত্র উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের মধ্যেও হয়ে থাকে, সে জন্য আমার মতে এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ হওয়া উচিত

“আল্লাহ তা‘আলার নামাবলী ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোনো অলি দরবেশ, জিন-পরী বা গ্রহ ও তারকা, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে সে সব বৈশিষ্ট্যের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে মনে করা এবং নবী, অলী, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মুখ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোনো কর্ম করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।”

শির্কে আকবারকারীর পরিণতি

পরিণতির দিক বিবেচনা করে এ শির্ককে বড় শির্ক বলা হয়। কেননা, তা শির্ককারীকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দেয়। কারণ; তা একটা প্রকাশ্য কুফরী কাজ। যেমন- কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ [البقرة[١٠٢ :

“তাঁরা (হারূত ও মারূত) কাউকে এ কথা বলেই জাদু শিক্ষা দিতেন যে, আমরা তোমাদের জন্য ফেতনা বিশেষ, সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা করে কুফরী করো না।”[2]

আমরা বাহ্যত দেখতে পাচ্ছি যে, এ আয়াতে জাদু শিক্ষা করাকে কুফরী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; এটা এ জন্যে যে, তা নিজ থেকে মানুষের অকল্যাণ করতে পারে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা করা শির্কের অন্তর্গত কাজ। অনুরূপভাবে হাদীসে কুদসীতে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারকার প্রভাবে

বৃষ্টিপাত হয় বলে বিশ্বাস করা শির্কী বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও এটিকে কুফরী বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ"

‘‘আমার বান্দাদের মধ্যে কতিপয় বান্দা আমার উপর বিশ্বাসী আর কতিপয় অবিশ্বাসী হয়েছে, যারা এ কথা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলার করুণায় আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়েছে, তারা আমার উপর ঈমান এনেছে। আর যারা বললো : অমুক অমুক তারকার প্রভাবের ফলে আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার প্রভাবের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।’’[3]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে জাদু শিক্ষা করা আর কোনো তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস করা যদি কুফরী কর্ম বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে জ্ঞানগত, উপাসনাগত, পরিচালনাগত ও অভ্যাসগত অন্যান্য যত সব শির্ক রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাও কুফরী কর্ম বলে গণ্য হবে। কেউ যদি এ সব বিষয়ে সতর্ক না হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করা ছাড়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তবে তার সমগ্র জীবনের যাবতীয় সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেয়ে জান্নাত তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে এবং জাহান্নামই তার চিরস্থায়ী আবাস স্থলে পরিণত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ﴾ [المائدة: ٧٢]

“যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।”[4]

মানুষেরা যাতে এ ধরনের শির্ক করা থেকে সতর্ক হয়, সে জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর প্রতি এই বলে সতর্কবাণী দিয়েছেন :

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: ٦٥]

“তুমি যদি শির্ক কর, তবে তোমার যাবতীয় ‘আমল ভস্ম করে দেয়া হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে যাবে।”[5]

শির্কের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ভাবে সতর্ক করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তারা যদি বুঝে বা না বুঝে কোনো শির্কী বিশ্বাস পোষণ করে বা কোন শির্কী কর্ম করে, তা হলে তাদের সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাতসহ জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সৎকর্ম আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যাবে।

শির্ক করার ফলে যার অবস্থা এই হয়ে দাঁড়ায়, সে ব্যক্তি যদি স্বীয় শির্ক থেকে স্বেচ্ছায় পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে ইসলামে নতুন করে প্রবেশ না করে, তা হলে আখেরাতে সে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তা‘আলা করুণার সাগর হয়ে থাকলেও কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর। তাই তিনি তাদের সৎকর্মের বিষয়টি কোনো বিবেচনায় এনে তাদের প্রতি কোনো করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। যারা স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ না করে তিনি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করার জন্যে তাদের অপকর্ম আরো চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। যেমনটি

সুযোগ করে দিয়ে পাকড়াও করেছিলেন আরবের কুরাইশ বংশের কাফির ও মুশরিকদের। কুরআনুল কারীমের বর্ণনানুযায়ী যদিও তারা আল্লাহ তা‘আলাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা এবং যাবতীয় বিষয়াদির পরিচালনাকারী বলে অকপটে স্বীকার করতো। যেমন- এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ﴾ [الزمر: ٣٨]

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসা করো যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা বলবে আল্লাহই তা সৃষ্টি করেছেন।”[6] অপর স্থানে বলেছেন:

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ﴾ [يونس: ٣١]

“তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে জীবিকা দান করে আকাশ ও জমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা করেন? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ।”[7]

আল্লাহ তা‘আলাকে সবকিছুর স্রষ্টা, জীবন ও জীবিকা দানকারী ও পরিচালনাকারী বিশ্বাস করার পাশাপাশি তারা নিজেদেরকে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীনের যথার্থ অনুসারী বলেও দাবী করতো। সে দ্বীনের উপাসনাদির মধ্যকার কিছু উপাসনা যেমন- কা‘বা গৃহের হজ্জ করা, সাফা ও মারওয়াঃ পর্বতদ্বয়ের মাঝে সা‘য়ী করা, কুরবানী করা, মিনায় অবস্থান গ্রহণ করা ইত্যাদি উপাসনাও তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করতো। কিন্তু, তারা শির্ক করতো বলে তাদের এ সব সৎকর্ম

তাদের কোন উপকারে আসে নি। বরং তাদের ব্যপারে আল্লাহ তা'আলার এ-হুকুম জারী হয়েছিল যে, তারা কাফির ও মুশরিক, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে তারা সবাই প্রবেশ করবে অত্যন্ত নিগৃহীত হয়ে।

দ্বিতীয় প্রকার : শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক

শির্কে আসগার এর সংজ্ঞা:

শির্কে আসগার এর সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে কোনো কোনো মনীষী বলেছেন : ‘‘শির্কে আকবার নয় এমন যে-সব কর্মকে শরী'আতের ‘নস’ অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগার। যেমন- কেউ যদি বলে : (ماشاء الله و شئت)‘আল্লাহ আর আপনি যা চান’, (و لو الله و أنت) আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন তা হলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেতো’। অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।’’[8]

ড. ইব্রাহীম বুরাইকান এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : ‘‘আমলের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সমান করে নেয়াকে শির্কে আসগর বলা হয়, যেমন- কোন কাজে বা কথায় লোক দেখানোর ভাব করা।’’[9]

ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাঃ (৬৯১-৭৫১হিঃ) শির্কে আসগার এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘‘উপাসনায় লোক দেখানো ভাব করা, মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা, আমি আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করেছি এমনটি বলা, আল্লাহ ও আপনি না হলে এমনটি হতো। এ সব উদাহরণ প্রদানের পর তিনি বলেনঃ শির্কে আসগার কখনও কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শির্কে আকবারেও রূপান্তরিত হতে পারে।’’[10]

আমার মতে ‘শির্কে আসগার’এর সংজ্ঞা হলো : ‘‘এমন সব কথা বা কাজ বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা‘আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়।’’ ‘শির্কে আসগার’ এর কতিপয় উদাহরণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নের উদাহরণগুলোও তা পরিচয়ের জন্য লক্ষ্যণীয় : যেমন- কোনো ব্যক্তির কথা : ‘আল্লাহ আর এই পোষা কুকুরটি না হলে আজ রাতে আমার বাড়ীতে চুরি হয়ে যেতো।’ ‘আল্লাহ এবং আপনি না হলে আজকে মহা অঘটন ঘটে যেতো।’ ‘আমি মাটি হাতে নিয়ে বা মায়ের নাম নিয়ে বা সন্তানের মাথায় হাত রেখে শপথ করে বলছি।’ ‘আমি আল্লাহর অনুগ্রহে এবং আপনাদের দু‘আয় ভাল আছি’ ইত্যাদি ধরনের কথা।

শর‘য়ী দৃষ্টিতে শির্কে আসগারকারীর পরিণতি :

এ শির্কটি পূর্বে বর্ণিত ‘শির্কে আকবার’ এর চেয়ে কম বিপজ্জনক। কেননা, এটি কর্তাব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না বা এতে যে শির্কে আকবার হয়ে থাকে, তাও বলা যায় না। এর প্রমাণ হলো- হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘‘একজন মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে এক ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে ইয়াহূদী লোকটি তাঁকে বললো : ‘তোমরা অত্যন্ত ভাল জাতি যদি না তোমরা শির্ক করতে। তোমরা বলে থাকো- আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি বলেন : ‘‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের এ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত আছি, তোমরা সে ভাবে কথা না বলে এ ভাবে বলো :

»مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ«

‘‘আল্লাহ তা‘আলা যা চান অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’’।[11] এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক আমলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মাঝে ‘আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’, এ-জাতীয় কথা-বার্তা বলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এমন কথা বলা থেকে বারণ করেন এবং এ ধরনের কথার বদলে নিম্নোক্ত কথা বলতে শিক্ষা দেন :

»ما شاء الله وحده«

‘‘আল্লাহ তা‘আলা এককভাবে যা চান’’।[12]

অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারাও সাহাবীদের মাঝে এ জাতীয় কথা বলার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন : ‘‘এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোন বিষয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে বললো :

»ما شاء الله وشئت«

‘আল্লাহ এবং আপনি যা চান’।

লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

»أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده«

"তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলে? বরং একমাত্র আল্লাহ যা চেয়েছেন।"[13]

এখন কথা হলো: এ জাতীয় কথা-বার্তা যদি তার কথককে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মত অপরাধ হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকেই অন্যান্য শির্কী কর্মকাণ্ড নিষেধ করার সাথে সাথে এ ধরনের কথা বলাও নিষেধ করে দিতেন। কিন্তু তা বিলম্বে নিষেধ করাতে প্রমাণিত হয় যে, এ জাতীয় কথা অপরাধের দিক থেকে 'শির্কে আকবার' এর মত বড় অপরাধ নয়। তবে তা যে সাধারণ অপরাধের মত একটি অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[14] তবে এথেকে বিরত থাকলে এর দ্বারা যে আল্লাহর তাওহীদের হেফাযত ও সংরক্ষণ হয়, তা বলা-ই বাহুল্য।[15] এ অপরাধ থেকে তাওবা করা ছাড়া কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজ থেকে তা মাফ করে দিতে পারেন। অথবা এমন অপরাধী ব্যক্তি শাফা'আতের সুবিধা পেয়ে হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত পেয়ে মুক্তি পেতে পারে। নতুবা অপরাধের মাত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কোনো মু'মিন ও ফেরেশতাদের শাফা'আত পেয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

তৃতীয় প্রকার : শির্কে খফী বা গোপন শির্ক

শির্কের খফীর পরিচয়:

গোপন শির্ক হচ্ছে সেই সব শির্ক, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এবং সৃষ্টির মাঝে সমকক্ষতার গন্ধ পাওয়া যায়। তবে তা শির্কে আকবার না শির্কে আসগারের অন্তর্গত, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না। এ জন্যে যে, ব্যক্তির মুখের কথা ও তার অন্তরে কী ইচ্ছা রয়েছে তা জানার কোনো উপায় নেই।[16] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের শির্কের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন:

«إِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ»

"এটা পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপের চেয়েও গোপন।"[17]

কর্তাব্যক্তির মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রকার শির্কের সাথে উপর্যুক্ত দু'টি শির্কের সম্পর্ক থাকার কারণে কোনো কোনো মনীষী এটাকে শির্কে আসগার এর মধ্যেই গণ্য করেছেন। এ চিন্তার আলোকেই শেখ 'আব্দুল 'আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান শির্ককে মোট তিন ভাগে বিভক্ত না করে দু'ভাগে বিভক্ত করে শির্কে খফীকে শির্কে আসগারের মধ্যেই গণ্য করেছেন।[18]আমার মতে শির্কের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ 'আব্দুল 'আযীয যে মত পোষণ করেছেন সেটাই সঠিক। কারণ, যারা শির্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন তারা তৃতীয় প্রকার শির্ককে দ্বিতীয় প্রকার শির্ক থেকে ভিন্নভাবে পরিচয় করার জন্যে পৃথক কোনো উদাহরণ পেশ করেন নি। তাদের আলোচনা পড়লে মনে হয় যেন শির্কে খফী অতি গোপন থাকার কারণে তারা দ্বিতীয় প্রকারের মধ্য থেকেই তৃতীয় প্রকার শির্কের জন্ম দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ বিভক্তির মাঝে তেমন কোনো লাভ নেই কারণ; শর'য়ী হুকুমের দিক থেকে শির্কে আসগার ও শির্কে খফী যে একই পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কারো দ্বি'মত নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এ

দু’টি শির্ককে মূলত যে কোনো একটি নামে নামকরণ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। অথবা শির্কে আকবার নয় এমন যাবতীয় শির্ককে এ দু’টি নামে নামকরণ করা যেতো। শির্কে আসগার এ বিবেচনায় যে, তা শির্কে আকবর এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, আর শির্কে খফী এ বিবেচনায় যে, এ শির্কটি বক্তার মনের গভীরে গোপন থাকায় তা শির্কে আকবার না আসগার এর অন্তর্গত- তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

[1]. ‘আব্দুল ‘আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০।

[2]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ: ১০২।

[3]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আযান, বাব নং ৭২, হাদীস নং ৮১০, ১/২৯০; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ঈমান, বাব নং৩২, ১/৮৩।

[4]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : ৭২।

[5]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৬৫।

[6]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার : ৩৮।

[7]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৩২।

[8]. আস-শায়খ ‘আব্দুল আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০।

[9]. ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৬।

[10]. আশ-শায়খ সুলাইমান ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল ওয়াহহাব, তাইসীরুল ‘আযীযিল হামীদ ফী শরহে কিতাবিত তাওহীদ; (বৈরুত : আল-মাকতবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০২হি.), পৃ.৪৫; আস-শায়খ আব্দুল ‘আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ.১৭০-১৭১।

[11].ইবনে মাজাহ, সুনান; কিতাবুল : কাফফারাত, বাব নং ১৩; ১/ ৬৮৫। মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, বুখারীর শর্ত অনুযায়ী এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য।

[12]. তদেব।

[13]. ইবনে কাছীর, তাফছীরুল ক্বুর‘আনিল ‘আযীম; (বৈরুত : দ্বারুল মা‘রিফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), ১/৬০।

[14]. ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৮।

শির্কের উৎপত্তি

আদম (আ:)ও নূহ (আ:)এর মধ্যকার ব্যবধান প্রায় সহস্রাব্দ ছিল।এ সময় মানুষ তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। তখন পৃথিবীতে কীনো শির্ক ছিল না। দুনিয়াতে প্রথম শির্ক সংঘটিত হয়েছিল নূহ (আ:)এর সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর তা হয়েছিলো সৎ ও বুযর্গ লোকদের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন ,

وَ قَالُوۡا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَکُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَ سُوَاعًا ۬ۙ وَّ لَا یَغُوۡثَ وَیَعُوۡقَ وَنَسۡرًا ۚ(٢٣)

'তারা বলল,তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ কর না, আর তোমরা ওয়াদ, ইয়াগূছ। ইয়াউক এবং নাসরকেও ত্যাগ কর না'4

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মহানবী সা: বলেছেন, এ আয়াতে যে ক'টি নাম এসেছে এগুলো নূহ আ: এএ কওমের বুযর্গ লোকের নাম। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের প্ররোচিত করলো,তারা যেন ঐসব বুযর্গদের বসার আসরে তাদের প্রতিমা বানিয়ে রাখে এবং তাদের নামে এগুলো নামকরণ করে। তারা তাই করলো। তবে এগুলোর উপাসনা হতো না।এসব লোক মৃত্যুবরণ করার পর ক্রমান্বয়ে তাওহীদের জ্ঞান বিস্মৃত হল,তখন এগুলোর উপাসনা ও পূজা শুরু হতে লাগলো।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক

প্রচারের ক্ষেত্রেও ইহূদী ষড়যন্ত্র ছিল মূল। আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক ইহূদী নিজেকে মুসলিম দাবি করে মক্কা-মদীনা থেকে দূববর্তী ইরাক, মিসর ইত্যাদি এলাকায় নও মুসলিমদের মধ্যে নবী-বংশের ভালবাসা, ভক্তি ও মর্যাদার নামে শিরকী বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে। মুসলিম উম্মাহর সকল শিরক-এর উৎস আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা এবং তার প্রচারিত শীয়া মতবাদ। দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া এবং বিশেষ করে বাতিনী শীয়া. কারামিতা, নুসাইরিয়্যাহ, দুরুয ইত্যাদি সম্প্রদায় অগণিত শিরক-কুফর মুসলিম সমাজে ছাড়িয়েছে।

বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী গত হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল বিভ্রান্ত দল রাষ্টীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। বাগদাদে মূল কেন্দ্রে বনূ বুওয়াইহিয়া শীয়াগণ ক্ষমতা দখল করে। কারামাতিয়্যা, বাতিনীয়া, হাশাশিয়া, ফাতিমীয়া বিভিন্ন শীয়া সম্প্রদায় মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইয়ামান, কূফা, বসরা, নজদ, খুরাসান, ভারত, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চলে রাষ্ট ক্ষমতা দখল করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এরা সাধারণ সরলপ্রাণ 'সুন্নী' মুসলিম, সূফী, দরবেশ ও ইলম-হীন নেককার মানুষদের মধ্যেও এদের শিরক প্রসার করতে সক্ষম হয়। মুসলিম উম্মাহর সকল শিরকের উৎস মূলত এখানেই।

পৌলের মত এরাও ব্যাখ্যা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং তার পাশাপাশি অগণিত মিথ্যা গল্প-কাহিনী রটনা করে এরা সমাজে শিরক ছড়িয়ে দেয়।

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক :

আমাদের দেশের গ্রাম ও শহরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে শিরক, বিদ'আত ও নানাবিধ কুসংস্কার। কুসংস্কারজনিত এমন শিরক রয়েছে যা এসব দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে। যেমন-

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাস করা

২.জ্যোতিবিদ্যা সংক্রান্ত

৩.রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব পদার্থ নির্মিত আংটি ও বালা পরিধান করা।

৪.জিন বা অপর কোনো রোগের অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে তা'বিয ব্যবহার করা।

৫.যাদু - টোনা বান মারা।

৬.মাযার স্পর্শ করা, শরীর মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া, কবরের মাটি বরকতের নিয়তে নিয়ে তা'বীযে করে গলায় বাঁধা, গায়ে মালিশ করা, রওযা শরীফ, মাযার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, সম্মান করা

৭.কবর ধোয়া পানি সুস্থতার নিয়্যাতে পান করা।

৮.পীর, ওলী-আওলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোম বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা

৯. পীরের নামে ওরশ করা।

১০.রজব মাস এলে খাজা 'বাবার ডেগ' নামক খানাপিনা রান্না করা।

১১.গায়রুল্লাহর নামে যিকির বা অযীফা

১২.পীরের পায়ে কদমবুসি করা, সিজদা দেওয়া।

১৩. সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে নবী রাসূলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া, যেমন- গোলাম মুস্তফা, আলী বখশ,গোলাম নবী, ইত্যাদি।

১৪.মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন : সিলভা, কোয়ান্টাম বা অন্য কোন মেথডের (পদ্ধতি) দ্বারা মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জন করার কথা বলা।

১৫.আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির অসীলা গ্রহণ_ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার আমার

কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা।

১৬.গায়রুল্লাহ'র নামে কসম করা।

১৭. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব - অনেকের ধারণা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

১৮. কোন দিন বা সময়কে নির্দিষ্ট করে শুভ অশুভ মনে করা।

১৯.নবজাতক বা শিশুদেরকে নযরের হিফাজতের জন্য কপালে টিপ দেওয়া, বা গলায় পয়সা বেঁধে দেওয়া।

২০.টাকা পয়সা বারবার কপালে লাগিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা।

শিরকী কর্মসমূহের বিবরণ

কোন কোন বিশ্বাস বা কর্ম করে অন্যান্য জাতির মানুষেরা মুশরিকে পরিণত হয়েছে তা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেন কোনো মুমিন কোনোভাবে এরূপ কর্মের মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত না হয়। আমরা দেখেছি যে, পূর্ববর্তী জাতিগণের শিরক ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইবাদতে। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক ছিল কম। আমরা এখানে বিষয়গুলি আলোচনা করব।

প্রতিপালনের শিরক

শিরক ফির রুবূবিয়্যাহ বা প্রতিপালনের শিরক ছিল আরবের মুশরিকদের মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন। সাধারণভাবে তারা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের একত্ব একবাক্যে স্বীকার করত। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, মহান আল্লাহ দয়া করে কিছু বান্দার প্রতি খুশি হয়ে তাদেরকে বিশ্বের পরিচালনা বা নিষ্ট-অনিষ্টের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এজাতীয় আরো কয়েক প্রকার শিরক তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের কাফিরগণ মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করত। কিন্তু তাদের অনেকেই আখিরাতে বিশ্বাস করত না। তাদের বিশ্বাস অনেকটা এরূপ ছিল যে, মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন, মানুষ যুগের আবর্তনে মরে শেষ হয়ে যায়। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এদের বিভ্রান্তি আলোচনা ও অপনোদন করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ

‘‘তারা বলে, ‘একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে।’ বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল ধারণার উপর নির্ভর করে।’’[1]

আমরা আগেই বলেছি যে, এরূপ কুফরী বা অবিশ্বাসও শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা যুগের আবর্তনকেই ‘রাবব’ বা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের গুণধারী বলে বিশ্বাস করছে।

[1] সূরা (৪৫) জাসিয়াহ: ২৪ আয়াত।

আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যাদেরকে ‘আল্লাহর বিশেষ বান্দা’ বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর কন্যা বা আল্লাহ পুত্র বলে আখ্যায়িত করত। প্রাচীনকাল থেকেই মুশরিকগণ বিভিন্ন যুক্তিতে আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে ‘আল্লাহর সন্তান’, ‘আল্লাহর পুত্র’, ‘আল্লাহর

কন্যা', 'আল্লাহর বংশধর' বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করত। যেমন মুশরিকগণ মালাইকা বা ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত এবং জিন্নদেরকে আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করত। এছাড়া কোনো কোনো ইহূদী 'উযাইর' (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। আর খৃস্টানগণ ঈসা মাসীহ (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। সাধারণত পুত্রত্ব বা সন্তানত্ব দ্বারা তারা একটি বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতো যা অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। এগুলি সবই মহান আল্লাহর মর্যাদার পরিপূর্ণতার সাথে সাংঘর্ষিক শিরকী বিশ্বাস। কুরআন কারীমে বারংবার এগুলির প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এরূপ বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবাদতের শিরক

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে মুশরিকগণ মূলত ইবাদতের শিরকেরই বেশি লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেছে। বস্তুত মানুষের মুর্খতা ও মানবীয় দুর্বলতা তাকে প্ররোচিত করে বিপদে আপদে 'মূর্ত', 'দৃশ্যমান' বা হাতের নাগালে পাওয়া কারো কাছে নিজের অসহায়ত্ব পেশ করে বিপদ থেকে উদ্ধারের আবেদন করা। মানুষ বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিপদের কথা বলে আকুতি জানায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষের দুর্বলতা ও অস্থিরচিত্ততা এভাবে অদৃশ্য প্রতিপালককে ডেকে তৃপ্ত হয় না। কি জানি তিনি শুনলেন তো! আমার সমস্যাটা দূর হবে তো! শয়তান এরূপ অস্থিরচিত্ততা ও দুর্বলতার সুযোগে মানুষকে প্ররেচিত করে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত 'দৃশ্যমান', বা 'হাতের নাগালে পাওয়া যায়' এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে। বান্দা ভাবে এতে হয়ত দ্রুত তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে তার এরূপ কর্মকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চায়।

এরূপ ব্যক্তি কখনোই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে স্রষ্টা, প্রতিপালক বা ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে না, বরং মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে ভক্তির অর্ঘ্য, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। এভাবেই ইবাদতের শিরক যুগে যুগে বিভিন্ন আসমানী ধর্মের অনুসারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

গাইরুল্লাহর সাজদা

সাজদা করা ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। চূড়ান্ত ভক্তি বা অলৌকিক ভক্তির প্রকাশ হিসেবেই শুধু সাজদা করা হয়। চাঁদ, সূর্য, প্রতিমা, ইত্যাদি সকল উপাস্যকে সাজদার মাধ্যমে ইবাদত করে মুশরিকগণ। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সাজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।”[1]

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, সাজদা, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের উদ্দেশ্যও ‘দু‘আ’ বা ‘ডাকা’। যাকে ডাকা হচ্ছে বা যার কাছে অলৌকিক প্রর্থনা করা হচ্ছে তিনি যেন খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি সাড়া দেন সেজন্যই সাজদা। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"এবং এই যে, সাজদা করার কর্মগুলি বা সাজদার স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য; সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[2]

[1] সূরা (৪১) ফুস্সিলাত: ৩৭ আয়াত।

[2] সূরা (৭২) জিন্ন: ১৮ আয়াত।

গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত

উৎসর্গ করা (sacrifice) ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। জীব জানোয়ার উৎসর্গ করা হলে আমরা সাধারণত কুরবাণী দেওয়া, বলি দেওয়া বা জবাই করা বলি। খাদ্য, ফসল, ফুল ইত্যাদী উৎসর্গ করা হলে সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের মুসলিম পরিভাষায় মান্নত, সদকা ইত্যাদি বলা হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষেরা আল্লাহকে বা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে খুশী করার জন্য, তাদের বর, আশীর্বাদ বা করুণা পাওয়ার জন্য বা তাদের প্রতি অন্তরের ভক্তি প্রকাশের জন্য জীব জানোয়ার, ফল-ফসল, ফুল-ফল খাদ্য ইত্যাদী উৎসর্গ করেছেন, বলি দিয়েছেন বা ভেট দিয়েছেন এবং এখনো দেন। উৎসর্গ কখনোও সাধারণভাবে করা হয, কোন রকম শর্ত (precondition) ছাড়াই একজন ভক্ত তার ভক্তির প্রকাশ হিসাবে উৎসর্গ দান করেন। কখনো বা তা মানত হিসাবে পেশ করা হয়, অর্থাৎ একজন ভক্ত উপাসক সিদ্ধান্ত নেন যে তার নির্দিষ্টমনোবাসনাপূর্ণ হলে তিনি তার উপাস্যর জন্য কিছু উৎসর্গ করবেন।সর্ব যুগের মুশরিকদের মত আরবের মুশরিকরাও জীব জানোয়ার, ফসল খাদ্য ইত্যাদি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতো এবং তাদের অন্য সকল উপাস্যের জন্যও উৎসর্গ করত। এ শিরকের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের অন্যান্য উপাস্যের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পেঁছে; তারা যা মিমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।"[1]

উৎসর্গ বিষয়ক শিরকের বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

"আমি তাদেরকে যে রিযক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।"[2]

কুরবানী বা উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার নির্দেশনা দিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ বা কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহরই নিমিত্ত, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক,তার কোন শরীক নেই। এজন্যই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

এবং আমি সর্বাগ্রে আত্মসমর্পণ করছি।"[3]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সম্বোধন করে বলেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং জবাই-কুরবানী কর।"[4]

এ জাতীয় শিরক আালোচনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেন: মুশরিকগণ মুর্তি, প্রতিমা ও গ্রহ-নক্ষত্রের করুণা ও নৈকট্য লাভের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে জবাই করত। এজন্য তারা জবাইদের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত। অথবা তাদের উদ্দেশ্যে বানানো বিশেষ বেদি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে নিয়ে পশু জবাই করত। কুরআনে তাদের এরূপ

করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন[5]:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

"বাহীরাহ, সায়িবা, ওয়সীলাহ ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেন নি; কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।"[6]

[1] সূরা (৬) আনআমঃ ১৩৬ আয়াত।

[2] সূরা (১৬) নাহল: ৫৬ আয়াত।

[3] সূরা (৬) আনআমঃ ১৬২-১৬৩ আয়াত।

[4] সূরা (১০৮) কাওসার: ২ আয়াত।

[5] সূরা (৫) মায়িদা: ১০৩ আয়াত।

[6] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৮৭।

গাইরুল্লাহর জন্য তাওয়াফ

কোনো কিছুর চারিদিকে আবর্তন করাকে তাওয়াফ বলা হয়। সাজদা ও সালাতের মতই তাওয়াফ একটি ইবাদত। সালাত-সাজদা ও তাওয়াফের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিশ্বের যে কোনো স্থানে থেকে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে আল্লাহর জন্য সালাত ও সাজদার ইবাদত আদায় করা যায়। পক্ষান্তরে আবর্তন বা তাওয়াফের ইবাদত একমাত্র কাবা গৃহের চারিদিকে আবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য এ ইবাদত পালন করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"এবং তারা তাওয়াফ করুক প্রাচীন গৃহের।"[1]

কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা দুভাবে হতে পারে:

প্রথমত, মহান আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালবাসা ও ভয়ের সাথে একমাত্র তাঁরই প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি প্রকাশের জন্য, অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা। এরূপ করা কঠিন হারাম ও নিষিদ্ধ, যেমন মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। কেউ যদি কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো দিকে মুখ করে সালাত আদায় অথবা কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর ইবাদত হিসেবে তাওয়াফ করা বৈধ মনে করে তবে তা শিরক ও কুফর বলে গণ্য।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য কোথাও তাওয়াফ করা। এরূপ করা সুস্পষ্টতই শিরক, যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাকে সামনে রেখে তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। লক্ষণীয় যে, শুধু আল্লাহকে খুশি করতে এবং তাঁরই প্রতি ভক্তি জানাতে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে কেউই তাওয়াফ করে না। যারা কোনো কবর, স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা অন্য কিছুর তাওয়াফ করেন তারা আল্লাহর ইবাদতের কথা বললেও পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁর নেক-নজর লাভেরও উদ্দেশ্য তাদের থাকে। নইলে কাবা ঘর বাদ দিয়ে অন্যত্র তাওয়াফ করবেন কেন?

[1] সূরা (২২) হাজ্জ: ২৮ আয়াত।

তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শিরক

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর 'অলৌকিকভাবে' নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা শিরক। এ জাতীয় শিরক এখনো এদেশের অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক। যেমন কোনো কর্ম শুরু করার সময়, যাত্রার সময় বা নৌকা চালানোর সময় আল্লাহর নামের সাথে গাজী পীর, চাচী পীর, পাঁচ পীর, খোয়াজ খিযির, বদর পীর বা অনরূপ কোনো সত্য বা কল্পিত পীর বা ওলীর নাম নেওয়া। অনুরূপভাবে মা, বাবা, খাজা বাবা, পাক পাঞ্জাতন বা অন্য কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, বা যাত্রার শুরুতে বা

কোনো কাজের শুরুতে এরূপ কারো নাম স্মরণ করে কপালে হাত দিয়ে সালাম করে বা মাথা নুইয়ে তার প্রতি সালাম জানিয়ে কাজ শুরু করা, কাজের শুরতে যন্ত্র, কাস্তে বা অন্য কিছুকে কপালে ঠেকানো বা সালাম করা, ফাতিমা (রাঃ)-কে বরকতের মালিক মনে করে ওযন করার সময় তাঁর নাম নিয়ে বা 'মা বরকত' নাম নিয়ে শুরু করা, প্রথম ফল, ফসল, দুধ ইত্যাদি মানিক পীর বা কারো নামে ফেলে দেওয়া এবং এভাবে তাদের সাহায্যের আশা করা .... ইত্যাদি অগণিত শিরকী কর্ম ও বিশ্বাস সমাজের আনাচে কানাচে এখনো বিদ্যমান। বস্তুত কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের অভাব, পূর্ববর্তী ও পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব, মানবীয় দুর্বলতা, আলিমগণের অসতর্কতা, স্বার্থান্বেষীদের লোভ ও অপপ্রচার, শয়তানের প্রতারণা ইত্যাদি কারণে এভাবে সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলিমগণ শিরকের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন।

শিরকের সেকাল ও একাল

শিরক বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের শিরকের সাথে মুসলিম সমাজের শীয়াগণ ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত বা অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত শিরকে লিপ্ত মানুষদের চিন্তা, যুক্তি ও কর্মের মধ্যে আমরা অদ্ভুৎ মিল দেখতে পাই।

(১) সকলেই আল্লাহকে একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করেন। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো ক্ষমতা নেই বলে স্বীকার করেন।

(২) সকলেরই শিরকের ভিত্তি এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তাঁদেরকে কিছু অলৌকিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাদের সুপারিশ তিনি ফেলেন না। এরূপ বান্দাদের ডাকলে তাঁরা তা শুনতে ও জানতে পারেন এবং নিজেদের ক্ষমতায় বা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ডাকলে এরা বান্দাকে আল্লাহ বেলায়াত বা নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়।

(৩) আল্লাহর ‘প্রিয় বান্দা’ নির্ধারণও সকলের ক্ষেত্রে একইরূপ: ওহীর মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কিছু সত্যিকার আল্লাহর প্রিয় বান্দার পাশাপাশি অনেক কল্পিত ব্যক্তিত্বকে এরা ‘আল্লাহর প্রিয়’ বলে দাবি করে।

(৪) সকলেরই দলীল দু‘আ ও শাফা‘আত বিষয়ক ওহীর নির্দেশনার বিকৃতি, মুজিযা বিষয়ক ভুল ধারণা, কিছু যুক্তি, কল্পনা, দাবি এবং লোকাচার।

(৫) শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় কুরআনের যে সকল যুক্তি ও বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি তা সবই পূর্ববর্তী মুশরিকদের মত একইভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যমান শিরকে লিপ্ত মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে আমরা শুধু একটি আয়াত পর্যালোচনা করব।

(৬) আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন: ‘‘বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমন্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।’’[1]

হিতাকাংক্ষী।’’[3]

এখানে শয়তান আদম ও হাওআ (আঃ)-কে এ কথা বলে নি যে, আল্লাহর আদেশ মানার দরকার নেই। বরং সে বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ অবশ্যই মানতে হবে, তবে আল্লাহর আদেশের ‘ইল্লাত’ কারণ, হেকমত ও রহস্যটা জানতে হবে এবং সে অনুসারে কাজ করতে হবে। এখানে আল্লাহ তোমাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ ফল খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে এবং জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। এখন যদি তোমরা জান্নাতে স্থায়ী থাকতে চাও তবে এ ফল খেতে পার। পাশাপাশি সে আল্লাহর কসম করে বলে যে, কেবলমাত্র তাদের ভালর জন্যই সে কষ্ট করে এ বুদ্ধি দিয়েছে....।

সকল যুগেই শয়তান এভাবেই আদম সন্তানদেরকে প্রতারণা করছে। মহান আল্লাহ সকল বিপদে আপদে একমাত্র তাঁকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। এখন শয়তান বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলছে, অমুক তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। শিরকের পথ রোধ করতে কবর পাকা করতে, কবররে উপর ঘর বা গম্বুজ বানাতে, কবর উচু করতে, কবরে কিছু লিখতে কবরের নিকট মসজিদ বানাতে, কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এর বিপরীতে কখনোই এরূপ কোনো কাজ করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দেন নি। এখন শয়তান বলছে, অমুক বা তমুক কারণে তা নিষেধ এবং অমুক বা তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। সকল শিরক, কুফর ও বিদ'আতের ক্ষেত্রেই শয়তানের মূল যুক্তি এটাই। এ বিষয়ে মুমিনকে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ নির্দ্বিধায় আক্ষরিকভাবে পালনই নাজাতের পথ।

[1] সূরা ফাতির: ৪০ আয়াত।

[2] সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৫১; সূরা (৬) আন‘আম: ৮১; সূরা (৭) আ’রাফ: ৩৩; সূরা (২২) হজ্জ: ৭১।

[3] সূরা (৭) আ’রাফ: ২০-২১।

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি

শিরক-কুফরের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তার অন্যতম:

ভয়ঙ্করতম পাপ

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফর মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

‘‘বল, ‘এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই: তা এই যে, তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না .....।’’[1]

ইতোপূর্বে আমরা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: ‘‘জঘণ্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহর সমতূল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’’

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

‘‘সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।’’[2]

কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না

তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

''আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।''[3]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا

''আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।''[4]

শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধরণভাবে পাপের কারণে পুন্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

''তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'।''[5]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”[6]

মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, নূহ, দাঊদ, সুলাইমান, আইঊব, ইউসূফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলইয়াস, ইসমাঈল, ইলইয়াসা, ইউনুস, লূত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এদ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শির্ক করত তবে তারা যা কর্ম করত সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যেত।”[7]

শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ

শিরক মুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহে কারো শাফা‘আতের কারণে বা শাস্তিভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন। সকল পাপীই মহান আল্লাহর বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন। তবে শিরকে লিপ্ত মানুষের জন্য কোনোই আশা নেই। জান্নাত একমাত্র তাওহীদ-পন্থীদের আবাসস্থল। এজন্য মহান আল্লাহ শিরকে লিপ্তদের জন্য তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।”[8]

আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً
"যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব।"[9]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلا الشِّرْكَ
"জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ করবে যে ব্যক্তি তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তুমি যদি পেতে তবে কি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসেবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে: হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম; তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে তুমি আমার সাথে শিরক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না।"[10]

[1] সূরা (৬) আন'আম: ১৫১ আয়াত।

[2] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫১৯, ২৫৩৫।

[3] সূরা (৪) নিসা: ৪৮ আয়াত।

[4] সূরা (৪) নিসা: ১১৬ আয়াত।

[5] সূরা (৩৯) যুমার: ৬৫ আয়াত।

[6] সূরা (৫) মায়িদা: ৫ আয়াত।

[7] সূরা (৬) আন'আম: ৮৮ আয়াত।

[8] সূরা (৫) মায়িদা: ৭২ আয়াত।

[9] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৬৮।

[10] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১

শির্ক প্রতিরোধে কুরআন এবং সুন্নাহ

শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের বিশেষ ব্যবস্থার অন্যতম শিরকের উৎসগুলি বন্ধ করা। আমরা দেখেছি যে, শিরক মূলত দুটি বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়: (১) মহান আল্লাহর প্রতি অব-ভক্তি বা কু-ধারণা এবং (২) বান্দার প্রতি অতিভক্তি বা অতি-ধারণা। আর এ দুটি বিষয় পরস্পরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহান আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি কু-ধারণা না হলে কেউ কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণের অর্থই হলো মহান আল্লাহর মর্যদা ও ক্ষমতার প্রতি অব-ধারণা পোষণ করা।

মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা

কুরআন ও হাদীসের প্রথম, প্রধান ও অন্যতম আলোচ্য বিষয় মহান আল্লাহর মর্যাদা, ক্ষমতা ও তাঁর তাওহীদ। বারংবার বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, সকল কর্তৃত্বের অধিকারী, বিশ্ব পরিচালনার অধিকার, ক্ষমতা, কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই। কেউ কিছু করতে পারে না, দিতে পারে না। তিনি দিলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কারো কোনো ইচ্ছার কোনা মূল্য নেই। তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা, অনুমতি ও মর্যির বাইরে কারো সুপারিশ, শাফা‘আত বা দু‘আ গ্রহণ করেন না। একমাত্র তাঁকেই ডাক, তাঁরই সাহায্য চাও, তিনিই তোমার ডাকে সাড়া দিবেন। আর তিনি না দিলে অন্য কেউ কোনোভাবে দিতে পারে না। এভাবে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা, ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তাঁর মর্যদা ও মহত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মুমিন অর্জন করতে পারেন। এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যে সকল বান্দার বিষয়ে অতিভক্তির কারণে শিরক করেছে তাদের অন্যতম ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রিয় নেককার বান্দাগণ। এ ছাড়া মুশরিকগণ অনেক বানোয়াট বা কল্পিত ব্যক্তিত্বকে 'আল্লাহর প্রিয়' বা 'আল্লাহর সন্তান' নাম দিয়ে শিরক করেছে। আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের সুপারিশ-শাফা'আত লাভের আশায় তাদের ইবাদত করত। কুরআন কারীমে তাদের এ অতিভক্তি রোধ করতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা মহান আল্লাহর সম্মানিত বান্দা মাত্র। তাঁরা শাফা'আতের সুযোগ পাবেন বটে, তবে তা তাদের ইচ্ছাধীন নয়, বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির অধীন। কাজেই শাফা'আতের আশায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত ভয়ঙ্কর পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। এ বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকগণ ইবরাহীম, ইসমাঈল, উযাইর, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবী-রাসূলের বিষয়ে অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে শিরকে নিপতিত হয়। এজন্য কুরআন কারীমের বারংবার নবী-রাসূলগণের আবদিয়্যাত বা বান্দাত্ব, বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর অক্ষমতা, গাইব সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তাঁদের অনুসারী ও মুমিনগণ তাঁদের প্রতি অবিচল ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁদের তাদের বিষয়ে অতিভক্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন। এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে বিভিন্ন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, মর্যাদা প্রদান ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণের নির্দেশনাবলিও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

আমরা দেখেছি যে, নেককার বা ওলী-আল্লাহগণের বিষয়ে অতিভক্তি ছিল মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অতিভক্তির পথ রোধ করা হয়েছে:

প্রথমত, ঈমান ও তাকওয়াকে বেলায়াত বা ওলীত্বের ভিত্তি ধরা হয়েছে। ওলীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে অলৌকিকতা, কারামাত ইত্যাদির কোনোরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। তাকওয়ার অধিকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয় তবে তা মহান আল্লাহর দেওয়া সম্মাননা বা কারামত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কারো অলৌকিক কার্য দেখে তাকে ওলী বলে মনে করার কোনোরূপ সুযোগ ইসলামে নেই। যেন মুমিন কারো অলৌকিক কর্ম দেখে তাকে নিশ্চিত ওলী বলে ধারণা না করে।

দ্বিতীয়ত, অলৌকিক কার্য দেখে তো কাউকে ওলী বলা যাবে না, এমনকি কুরআন-হাদীসে যাকে বেলায়াতের দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ঈমান ও তাকওয়া দেখেও কাউকে সুনিশ্চিত ওলী বলে নিশ্চিয়তা দেওয়া যায় না। কারণ, ‘ঈমান’ ও ‘তাকওয়া’ উভয়ই মূলত হৃদয়ের অভ্যন্তরের লূক্কয়িত বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। মুমিনের কর্ম তার ঈমান ও তাকওয়ার আলামত মাত্র, যা দেখে ঈমান ও তাকওয়ার বিদ্যমানতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বাহ্যিক ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সকল মুমিনই আল্লাহর ওলী। যারা তাকওয়া ও নেক-আমল যত বেশি সে তত বেশি আল্লাহর প্রিয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিতভাবে ওলী বলে চিহ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। নির্ধারিতভাবে কাউকে ‘ওলী’ বলে

নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, ওহীর নির্দেশানা বাইরে কাউকে নিশ্চিতরূপে জান্নাতী বলতেও আপত্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে উসমান ইবনু মাযঊন (রাঃ) বিষয়ক হাদীসটি ইতোপুর্বে আমরা দেখেছি। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا وَلا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ

“কোনো ব্যক্তিকেই তার নিজের আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও নন? তিনি বলেন, না, আমিও নই, যদি আল্লাহ আমাকে মহানুভবতা ও রহমত দিয়ে আবৃত করে না নেন।”[1]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামে মানুষের বাহ্যিক নেক কর্মের ভিত্তিতে সম্মান করতে ও ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হলেও, কোনো বাহ্যিক কর্ম বা কারামাতের ভিত্তিতে কাউকে সুনিশ্চিত ওলী তো দূরের কথা জান্নাতী বলার কোনো সুযোগ রাখা হয় নি। সর্বোপরি কোনো ওলীকে আল্লাহ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন বা দেন এরূপ কোনো কল্পনা করার সুযোগ ইসলামে নেই। কুরআন বা হাদীসে কোথাও এরূপ কিছু বলা হয় নি। এমনকি সাহাবীগণ নেককার বুজুর্গদের নিকট দু‘আ চাওয়ার বিষয়েও বাড়াড়াড়ি পরিহার করতে পরামর্শ দিতেন। সাধারণভাবে মুমিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদের জন্য দু‘আ করতে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট দু‘আ চাইতেন। তাঁরা একে অপরের কাছেও দোয় চেয়েছেন কখনো কখনো। এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : উমর (রা.) উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লহ (ﷺ) অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন : আমাদেরকেও তোমার দু‘আার মধ্যে মনে রেখ, ভুলে যেও না।[2]

তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দু‘আ চাইলে তাঁরা দু‘আ করতেন। এক ব্যক্তি আনাস (রা.) -এর কাছে এসে দু‘আ চায়। তিনি বলেন: “আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।” (অর্থাৎ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) ঐ ব্যক্তি বার বার দু‘আ চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন।[3]

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবী দু‘আ চাইলে দু‘আ করতেন না, কারণ এতে মানুষ দু‘আ চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমরের (রা.) কাছে চিঠি লিখে দু‘আ চায়। তিনি উত্তরে লিখেন :

إِنِّيْ لَسْتُ بِنَبِيٍّ، ولكن إذا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ لِذَنْبِكَ

‘‘আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দু‘আ করব বা আমার দু‘আ কবুল হবেই), বরং যখন সালাত কায়েম করা হবে, তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।’’[4]

সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলেন: আপনি দু‘আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দু‘আ চান। তখন তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী? (যে সবার জন্য দু‘আ করব বা আমার দু‘আ কবুল হবেই)।[5]

[1] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৪৭, ২৩৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১৬৯-২১৭১।

[2] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/৮০; ইবনু মাজাহ, আস- সুনান ২/৯৯৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/২২১; আলবানী, যায়ীফু সুনানি ইবনু মাজাহ পৃ: ২৩৫। হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান সহীহ ও হাইসামী যয়ীফ বলেছেন।

[3] শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০০-৫০১।

[4] শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০১।

[5] শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০১।

শির্ক গুনাহ আল্লাহ করবেন কিনা

শিরক একটি অমার্জনীয় পাপ *(নিসা ৪/৪৮)* যাকে আল্লাহ মহা যুলুম বা অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন *(লোক্বমান ১৩)*। তবে সে প্রকৃতপক্ষে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে শিরক থেকে ফিরে আসলে এবং আমলে স্বলেহ করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ বলেন, 'তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে'

ইস্তেগফার: মুমিনের জীবনে মুক্তির রাজপথ

ইস্তেগফারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি শব্দ-তওবা। শব্দদুটি প্রায় সমার্থক। ইস্তেগফার অর্থ কৃত গোনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে অনুতাপ ও অনুশোচনার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আর তওবা অর্থ ফিরে আসা, পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসা, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা, ভুল পথ ছেড়ে মহান প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসা। এ তওবা-ইস্তেগফার একজন মুমিনের বড় গুণ। গোনাহের অভিশাপ থেকে নিজেকে পবিত্র করার হাতিয়ার। মানবীয় দুর্বলতার কারণেই আমরা শিকার হই শয়তানের কুমন্ত্রণার। আর তখন বিভিন্ন গোনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ি। সে গোনাহ থেকে মুক্তির পথই হচ্ছে তওবা ও ইস্তেগফার। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, মানুষ কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার পর যদি সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং এজন্যে সে কায়মনোবাক্যে মহান প্রভুর কাছে অনুতপ্ত হয়, তাহলে সে গোনাহ যত বড়ই হোক না কেন, তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের আহ্বান কতটা সরল, দেখুন-

.قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ۝ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۝ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم

(হে নবী,) তুমি বলে দাও, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। -সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

তওবা করলে আল্লাহ তাআলা কি শুধু আমাদের গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেন? এতটুকু হলেই তো যথেষ্ট ছিল। অবাধ্য গোলাম যদি ক্ষমা চেয়ে অবাধ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে, তবেই তো যথেষ্ট। কিন্তু তওবাকারী বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত আরও অনেক ব্যাপক। কয়েকটি বড় পাপের বর্ণনা দেয়ার পর তিনি ঘোষণা করেছেন-

يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا، اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ، وَ كَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

...(এ সকল পাপে যে জড়াবে) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। আল্লাহ তাদের পাপরাশিকে পুণ্য দিয়ে পাল্টে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৯-৭০

তবে তওবার এ প্রতিদান তাদের ভাগ্যেই জুটবে, যারা তওবা করবে খাঁটি মনে। অতীতের গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে সে অন্যায় আর কখনো না করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। এর পাশাপাশি কৃত অপরাধের দায়মুক্তির চেষ্টা করবে। বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হলে তা আদায় করতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। আর যদি আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট হয় তবে সম্ভব হলে কাযা আদায় করবে। এমন যে করতে পারে তার তওবাই আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় এবং তাঁর ক্ষমার বর্ষণে সিক্ত হয়। এমন তওবার পুরস্কারের কথা আল্লাহ জানিয়েছেন এভাবে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا، عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো-বিশুদ্ধ তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের প্রভু তোমাদের পাপগুলো মুছে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদীসমূহ বয়ে যায়। -সূরা তাহরীম (৬৬) : ৮

কথা থেকে যায়, প্রথমবার যেমন শয়তানের প্ররোচনায় গোনাহ হয়ে গেল, তেমন তো পরে আবারও হতে পারে। তা হোক, যখনই কেউ গোনাহে জড়াবে, তখনই যদি আবার সে গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হয়, আবারো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়-এ কাজ আর কখনো করবে না, তবে প্রতিবারই আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন। আমরা তাঁর গোলাম, বান্দা, তিনি আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক। দুনিয়াতে কোনো কর্মচারী বা ভৃত্য যদি তার মনিবের কোনো আদেশ অমান্য করে এসে আকুতিভরে ক্ষমা চায়, তাহলে মনিব তাকে ক্ষমা করে। কিন্তু এক-দুইবার ক্ষমা করার পরও যদি আবার একই অন্যায় সে করে তখন মানুষ তার কর্মচারীকে ক্ষমা করতে পারে না। মানুষ তো কোনো দিক দিয়েই অসীম নয়। তার শক্তি ও সামর্থ্য সীমিত, তার ক্ষমার গুণও সীমিত, সীমিত তার সহনশীলতা ও ধৈর্যের ক্ষমতাও। অথচ আল্লাহ তাআলা অসীম দয়া ও শক্তির অধিকারী। পাপ যত বড় হোক, যত বেশি হোক, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ দয়া ও ক্ষমার তুলনায় তা মোটেও বড় নয়। বান্দা যখন তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে হাত বাড়ায়, তিনি তাতে অত্যন্ত খুশি হন। হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এভাবে- এক লোক নির্জন মরুভূমিতে সফরে বের হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে তার বাহন উট এবং সে উটের উপরই তার খাবার-পানি। সফরের এক পর্যায়ে সে উট থেকে নীচে নেমে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জেগে দেখে, তার উটটি তাকে রেখে চলে গেছে। মরুভূমির গরমে তার প্রচÐ তৃষ্ণা পেল। কিন্তু উত্তপ্ত মরুভূমিতে তৃষ্ণা মেটাবার কিংবা সেখান থেকে ফিরে আসার অথবা পায়ে হেঁটে কোনো লোকালয়ে চলে যাওয়ার কোনো পথ তার সামনে ছিল না। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষাই তখন একমাত্র পথ। নিরাশ মনে সে ভাবল, যেখানে ঘুমিয়েছিলাম, সেখানেই আবার ঘুমিয়ে পড়ি! এমনি এক মুহূর্তে তার হারিয়ে যাওয়া উটটি ফিরে এল। উটটি পেয়ে যেন সে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এল। খুশির আতিশয্যে দিশেহারা হয়ে সে বলে উঠল, হে আল্লাহ! আমি তোমার রব আর তুমি

আমার বান্দা! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তওবা করে, তখন তিনি তার তওবায় মরুভূমিতে উট হারিয়ে ফিরে পাওয়া এ ব্যক্তিটির চেয়েও বেশি খুশি হন। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৪৭)

তওবা-ইস্তেগফার কেবল যে গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম এমন নয়, এর মাধ্যমে বান্দার আত্মিক উন্নতিও সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيّهَا النّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرّةٍ.

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো। আমি তো তাঁর কাছে দৈনিক একশ বার তওবা করি। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০২

গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হওয়া সত্ত্বে¡ও তিনি প্রতিদিন এত বেশি পরিমাণে মহান প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। অথচ তিনি যে গোনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন, তা তো বলাবাহুল্য।

আর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যে জানাশোনা কোনো গোনাহ হতে হবে- তা নয়। নিজেদের অজান্তে কত গোনাহে আমরা জড়াই- কে জানে! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ক্ষমাপ্রার্থনার একটি দুআ শিখিয়েছেন এভাবে-

...فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ

... আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন (আমার সকল গোনাহ), যা আমি আগে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যে গোনাহ সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে বেশি অবহিত। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৪৪২

ক্ষমা চাইতে হবে এভাবেই- জানা-অজানা, ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সকল গোনাহ থেকে। এভাবে তওবা করলে আল্লাহ গোনাহ মাফ করবেন, গোনাহ যদি কখনো না থাকে তবে তখন এতে আত্মিক উন্নতি সাধিত হবে।

এর পাশাপাশি দুনিয়ার নানা সময়ের নানামুখী বিপদ থেকে মুক্তির জন্যেও আমাদেরকে এ তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে- এটাই নবীদের শিক্ষা। স্বাভাবিক কথা, পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে দুনিয়ার বিপদাপদ যেহেতু আমাদেরই কৃতকর্মের ফল, তাই এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে অন্যায় কাজগুলোকে তো ক্ষমা করিয়ে নিতে হবেই-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِی النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن.

মানুষের কৃতকর্মের কারণেই জলে-স্থলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, যেন তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যেন তারা ফিরে আসে। -সূরা রূম (৩০) : ৪১

চির শ্বাশ্বত এ বাণী বর্তমান সময়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। সারা পৃথিবী এখন ছোট অদৃশ্য এক ভাইরাসের জন্যে অস্থির। প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা। হাজার ছাড়িয়ে লাখ, লাখ ছাড়িয়ে এখন কোটিতে। সন্দেহ নেই, এ আমাদেরই কৃতকর্মের ফল। করোনাভাইরাসের এ মহামারিসহ অন্য যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে আমাদেরকে তওবা-ইস্তেগফারের আশ্রয় নিতেই হবে।

সবশেষে ইস্তেগফার আমাদের দুনিয়ার জীবনকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পারে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এর একটি নমুনা উল্লেখ করছি-

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল। (ক্ষমাপ্রার্থনা করলে) তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদেরকে তিনি ধনসম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন। তোমাদের জন্যে তিনি বিভিন্ন রকমের বাগান ও অনেক নদ-নদী সৃষ্টি করে দেবেন। সূরা নূহ (৭১) : ১০-১২

উপসংহার

শিরক ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে হলে কুরআন ও হাদিসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তাওহিদ বিষয়ক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবীগণ কিভাবে শিরকমুক্ত জীবন যাপন করেছেন তার সঠিক ইতিহাস জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। শিরক ও শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় আল্লাহর নিকটে প্রাণ খুলে দোয়া করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। রাসূল সা. শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করতেন,

ُاللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَم

"হে আল্লাহ, জেনে বুঝে শিরক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের অজ্ঞাত শিরক থেকে আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি।" (মুসনাদু আহমাদ-১৯৬০৬)